অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

বৈষ্ণব আন্দোলনে জাহ্নবা দেবীর অবদান

মুগ্ধ মজুমদার

মধ্যযুগীয় বাংলার একমেবাদ্বিতীয়ম্ প্রাণপুরুষের নাম শ্রীচৈতন্যদেব। একদিকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত এবং অন্যদিকে রক্ষণশীল স্মার্ত হিন্দু সংস্কারের পীড়নে বাঙালি জীবন যখন ধ্বস্ত ও নিপীড়িত, সেই বিশেষ ক্রান্তিকালেই তাঁর আবির্ভাব। বৈষ্ণব আচার্যদের মাধ্যমে মহাপ্রভুর দর্শিত ধর্মাচরণ ক্রমশ পরিণতি লাভ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অবয়বে। চৈতন্যদেবের আচণ্ডালদ্বিজ ভক্তিবাদের প্রচারে যেমন জাতপাতের সংকীর্ণ গণ্ডির গিঁট খুলে মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তেমনই মধ্যযুগের বাঙালি নারীরাও অন্দরমহলের চৌহদ্দি থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধিকারের পথ পেয়েছিলেন। চৈতন্য-উত্তর যুগে বৈষ্ণব আচার্যদের পাশাপাশি স্ত্রী-গুরুরাও বৈষ্ণবধর্ম প্রসার ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ষোড়শ শতকের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঘরানায় প্রথিতযশা মা-গুরু রূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবা দেবী—তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে যাঁকে 'ঈশ্বরী' আখ্যায় অভিহিত করা হত। তিনিই ছিলেন প্রথম মহিলা যিনি মন্ত্রদীক্ষা দানের অধিকারিণী হয়েছিলেন।

জাহ্নবা দেবীর জন্ম ১৪৩১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে, অম্বিকা-কালনায়। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে তাঁর পিতামাতার পরিচয় পাই—

''ভদ্রাবতী নাম শ্রীজাহ্নবার জননী।
অতি পতিব্রতা সূর্যদাসের ঘরণী॥''

সূর্যদাসের দুই কন্যার মধ্যে বসুধা দেবী ছিলেন জ্যেষ্ঠা। তৎকালীন বাংলার সুলতানের দরবারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন সূর্যদাস। তাঁর কর্মদক্ষতার জন্য তিনি 'সরখেল' উপাধি লাভ করেছিলেন। এই সুলতান কে ছিলেন সেই বিষয়ে বলা না থাকলেও অনুমান করা যায়। সামসুদ্দিন মুজফ্ফর শাহ ১৪৯০ থেকে ১৪৯৪ পর্যন্ত এবং হুসেন শাহ ১৪৯৪ থেকে ১৫১৮ পর্যন্ত গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। জাহ্নবার জন্মের সময় বা তার আগে সূর্যদাস 'সরখেল' উপাধি পেয়ে থাকলে তা এই দুই সুলতানের রাজত্বকালের নিকটবর্তী। মুজফ্ফর শাহের রাজত্বকাল ছিল মাত্র চার বছর। তাছাড়া ইতিহাসে তাঁর অবদান খুব বেশি ছিল না, যতটা ছিল হুসেন শাহের। সম্ভবত তাঁরই রাজত্বে সূর্যদাস রাজকর্মচারীর পদ লাভ করেন, কারণ হিন্দু রূপ-সনাতনের মতো সূর্যদাসেরও সুলতানি কর্মী হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সূর্যদাসের তিন ভ্রাতার

নিত্যানন্দের বিবাহস্থল, অম্বিকা কালনা

মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিলেন নিত্যানন্দের দ্বাদশ গোপালের* অন্তর্গত গৌরীদাস পণ্ডিত (কৃষ্ণ-বলরামের বৃন্দাবনলীলার সুবল গোপাল)। সূর্যদাস ও গৌরীদাস দুজনেই শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ভাগবতচর্চায় সূর্যদাসের বিশেষ খ্যাতি ছিল বলে জানা যায়। গৌরীদাস রচিত বৈষ্ণব পদ সেকালে বিশেষ সমাদৃত ছিল। সরখেল পরিবারের শাস্ত্রীয় ভাবধারা যে জাহ্নবা দেবীকেও প্রভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই, যদিও তাঁর বিদ্যাচর্চা নিয়ে তেমন কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না।

মহাপ্রভু তাঁকে গৃহী হওয়ার নির্দেশ দিলে নিত্যানন্দ সূর্যদাসের বড় মেয়ে বসুধা দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু প্রথমে এই বিবাহে সূর্যদাসের সম্মতি ছিল না বলেই জানা যায়। দুরারোগ্য ব্যাধিতে বসুধা দেবীর মৃত্যু হলে গৌরীদাস পণ্ডিত সূর্যদাসকে নিত্যানন্দের দ্বারস্থ হওয়ার অনুরোধ জানান। ভাইয়ের কথামতো কন্যাহারা পিতা নিত্যানন্দের শরণাপন্ন হলে নিত্যানন্দের দিব্য শক্তির প্রভাবেই বসুধা পুনরায় জীবন ফিরে পান। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে নিত্যানন্দের ইচ্ছায় বসুধাকে ও যৌতুকরূপে জাহ্নবা দেবীকে নিত্যানন্দের কাছে সম্প্রদান করেন সূর্যদাস।

'ভক্তিরত্নাকর' অনুযায়ী বিবাহের পরে স্ত্রীদের নিয়ে বড়োগাছিতে শ্রীকৃষ্ণদাস হোড়ের বাড়িতে ওঠেন নিত্যানন্দ—

''শ্রীবসু-জাহ্নবা সহ প্রভু নিত্যানন্দ।
আইলেন বড়োগাছি হৈল মহানন্দ॥
শ্রীবাসের ভার্যা-আদি প্রবীণা সকল।
কৈল যে বিহিত হৈয়া আনন্দে বিহ্বল॥''

বড়োগাছি বাসের পর নিত্যানন্দ গিয়েছিলেন নবদ্বীপে শচীমাতার আশিস নিতে—

''শ্রীবসু জাহ্নবা দোঁহে দেখি এথা আই।
করিল যতেক স্নেহ কহি সাধ্য নাই॥''

এরপর নিত্যানন্দ শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য-সীতাদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের বাড়ি হয়ে খড়দহে পৌঁছন। খড়দহে তাঁরা পাকাপাকিভাবে সংসার স্থাপন করেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে বসুধা-জাহ্নবার দাম্পত্যের কথা কোনও জীবনীগ্রন্থেই পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দের প্রয়াণের পর জাহ্নবার কথা আবার পাই

* কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেনের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' গ্রন্থ অনুযায়ী কৃষ্ণ-বলরামের ব্রজলীলায় তাঁদের নিত্যসঙ্গী হিসেবে বারোজন গোপবালক অবস্থান করতেন। মহাপ্রভুর নদীয়ালীলায় এই বারোজন গোপালই পুনরায় আবির্ভূত হন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে, যাঁরা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। মূলত নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গেই এই দ্বাদশ গোপালের অধিক নৈকট্য ছিল বলে জানা যায়। নদীয়ালীলার এই দ্বাদশ গোপাল হলেন— অভিরাম ঠাকুর (ব্রজলীলায় শ্রীদাম), সুন্দরানন্দ (সুদাম), ধনঞ্জয় পণ্ডিত (বসুদেব), গৌরীদাস পণ্ডিত (সুবল), কমলাকর পিপিলাই (মহাবল), উদ্ধারণ দত্ত (সুবাহু), মহেশ পণ্ডিত (মহাবাহু), পুরুষোত্তম ঠাকুর (স্তোককৃষ্ণ), নাগর পুরুষোত্তম (দাম), পরমেশ্বর দাস (অর্জুন), কালা কৃষ্ণদাস (লবঙ্গ) এবং শ্রীধর পণ্ডিত (কুসুমাসব)।

নিত্যানন্দদাসের 'প্রেমবিলাস' এবং নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে।

দুই

বস্তুত নিত্যানন্দের প্রয়াণের পরেই জাহ্নবা দেবীর ভূমিকা ক্রমশ বাড়তে থাকে বৈষ্ণব সমাজে। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর বৈষ্ণব সমাজে নেতৃত্বের অভাব ক্রমশই প্রকট হচ্ছিল। বৈষ্ণব ধর্মের এই সংকটের দিনে জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রবর্তিত তত্ত্ব ও দর্শনকে স্বীকার করে সমস্ত বৈষ্ণব সমাজকে সেই পথ অনুসরণের পরামর্শ দেন। তাছাড়া নিত্যানন্দ প্রভুর সুবৃহৎ শিষ্যমণ্ডলীকে পরিচালনা ও সেইসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের গুরু দায়িত্ব ছিল জাহ্নবার উপর। এই বৃহৎ পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য তিনি অন্তত দুবার বৃন্দাবন যাত্রা এবং বাংলার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। নিত্যানন্দদাসের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের ষোড়শ বিলাসে জাহ্নবার প্রথমবার বৃন্দাবন যাত্রার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর যাত্রাপথ উল্লিখিত হয়েছে রাজবল্লভ গোস্বামীর 'মুরলীবিলাস' গ্রন্থে। এই গ্রন্থানুযায়ী তিনি খড়দহ থেকে প্রথমে যান কণ্টকনগরী বা কাটোয়ায়—

''গঙ্গা পার হই চলে গঙ্গা ধারে।
প্রভুর মুণ্ডন স্থান কণ্টক নগরে॥''

এরপর একে একে তিনি মৌড়েশ্বর, একচক্রা, গৌড় হয়ে গয়াধামে বিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শন করে বৃন্দাবনে পৌঁছন। বৃন্দাবনে তাঁকে স্বাগত জানান রূপ ও সনাতন গোস্বামী। এইসময় রূপ গোস্বামী জাহ্নবার নির্দেশমতো 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব' ও 'দানকেলিকৌমুদী'র ব্যাখ্যা ও পাঠের ব্যবস্থা করেন। জাহ্নবা দেবী এই চারটি গ্রন্থের ব্যাখ্যা যদি শুনে থাকেন তবে অনুমিত হয় এই গ্রন্থগুলি রচনার পরেই তিনি প্রথমবার বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। ফলত তাঁর প্রথমবার ব্রজধাম গমনের সময়টিও মোটামুটি অনুমান করা চলে। উল্লিখিত চারটি গ্রন্থের মধ্যে শেষে রচিত 'দানকেলিকৌমুদী'র রচনাকাল ১৪৭১ শক বা ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ এইটুকু নিশ্চিত যে ১৫৪৯-এর আগে জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে যাননি। তাঁর পরবর্তী বৃন্দাবন যাত্রা রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত খেতুরি মহোৎসবের (১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ) ঠিক পরে। এই উৎসবের গুরুত্ব ছিল যুগান্তকারী। একদিকে বৈষ্ণব সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং অন্যদিকে লীলাকীর্তনের আঙ্গিকের স্পষ্ট রূপ দান ছিল এই উৎসবের লক্ষ্য, যার কর্ণধার ছিলেন জাহ্নবা দেবী। 'প্রেমবিলাস' অনুযায়ী তাঁরই নির্দেশমতো নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস প্রমুখ আচার্যগণ এই উৎসব সম্পন্ন করেছিলেন।

''শ্রীঈশ্বরীর আজ্ঞায় আচার্য শ্রীনিবাস।
অভিষেক আরম্ভিলা যতেক উল্লাস॥''

উৎসব শেষ হলে জাহ্নবা দেবী মীনকেতন রামদাস, কমলাকর পিপিলাই প্রমুখ নিত্যানন্দ-শিষ্যদের খড়দহে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং নিজে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করেন। এই যাত্রাকালে দুটি ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'ভক্তিরত্নাকর' অনুযায়ী দেবী চণ্ডীর উপাসক একদল 'পাষণ্ডী' পথমধ্যে জাহ্নবাসহ বৈষ্ণবদের নিয়ে উপহাস ও কটূক্তি করে সংকল্প করে : 'অদ্য রাত্রে এ-গুলার করিব সংহার'। কিন্তু স্বপ্নে দেবী চণ্ডীই তাদের নির্দেশ দেন জাহ্নবা ঠাকুরানির শরণাপন্ন হতে। পরদিন জাহ্নবার কাছে তারা উপস্থিত হলে—

''শ্রীঈশ্বরী অনুগ্রহ কৈলা অতিশয়।
পাষণ্ডীগণের হৈল উল্লাস হৃদয়॥''

এরপরে কোনও এক গ্রামে জাহ্নবার রাত্রিবাস-কালে যবন দস্যু আক্রমণ করে তাঁর ধন লুণ্ঠন করে। কিন্তু সারারাত খুঁজেও পলায়নের পথ না পেয়ে তারা জাহ্নবার মহিমা সম্পর্কে অবহিত হয় এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বলাবাহুল্য

জাহ্নবা দেবীর বসার স্থান, রাধাকুণ্ড

এদেরও জাহ্নবা দেবী ক্ষমা করে অনুগ্রহ দান করেন। এরপর তিনি প্রথমে মথুরা ও পরে বৃন্দাবনে যান। রাধাকুণ্ডের ধারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও কৃষ্ণদাসের।

মথুরায় যমুনাতীরের একটি গ্রামে এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যুবক পুত্র মারা গেলে তিনি জাহ্নবার দ্বারস্থ হন। ব্রাহ্মণের অসহায় অবস্থা দেখে জাহ্নবার করুণা হয়। তাঁর দিব্য স্পর্শে মৃত পুত্রের প্রাণ ফিরে আসে। অর্থাৎ সেইসময় জাহ্নবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ও প্রভাবের কথা বাংলা থেকে বৃন্দাবন পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছিল।

বৃন্দাবনে রাধা-গোপীনাথ দর্শনের সময় তাঁর মনে হয়—''শ্রীরাধিকা কিছু উচ্চ হইলে ভালো হয়।'' এরপর তিনি প্রসিদ্ধ নয়ন ভাস্করকে ডেকে নতুন রাধা-মূর্তি নির্মাণের নির্দেশ দেন। বাংলায় ফিরে এসে সেই মূর্তি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেন।

জনশ্রুতি, তিনি আরও একবার এই রাধামূর্তি দর্শন করতে বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন। সেখানে গোপীনাথের মন্দিরে গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে তিনি লীন হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণের বামদিকে সদাপ্রতিষ্ঠিত রাধিকার মতো শ্রীকৃষ্ণের ডানপাশে অনঙ্গরাধিকার বিগ্রহরূপ পরিগ্রহ করেন।

তিন

ব্যক্তিগত জীবনে জাহ্নবা দেবী ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর বড়দিদি ও সপত্নী বসুধা দেবীর পুত্র বীরচন্দ্র ও কন্যা গঙ্গামণিকে তিনি নিজের পুত্র-কন্যার মতোই লালন-পালন করেছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-এ বর্ণিত হয়েছে ব্রজধাম-ফেরত জাহ্নবার সঙ্গে পরিবারের সকলের মিলনের স্নেহার্দ্র চিত্র—

''গঙ্গা, বীরচন্দ্র অতি উল্লসিত মনে।
প্রণমিলা শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী-চরণে॥
গঙ্গা-বীরচন্দ্র-মুখ করি নিরীক্ষণ।
স্নেহবশে ঈশ্বরীর সজল নয়ন॥''

বীরচন্দ্রকে আদর্শ জননেতা হিসেবে গড়ে তোলার পিছনে জাহ্নবার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বীরচন্দ্রকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করে তুলে বৃন্দাবন ও বাংলার বৈষ্ণব আচার্যদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও নিবিড় যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁরই ঐকান্তিক উদ্যোগে ঝামটপুরের যদুনন্দন আচার্যের দুই কন্যা শ্রীমতী ও নারায়ণীর সঙ্গে বীরচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিবাহের পর জাহ্নবা দেবী পুত্রবধূদের মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। তিনি প্রথম জীবনে বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্রকে

রাধা-গোপীনাথ মন্দিরের বিগ্রহ

দত্তক নিয়েছিলেন। শর্ত ছিল, যদি বংশীবদনের পুত্রবধূর দুই পুত্র হয়, তবে দ্বিতীয় পুত্র জন্মের পর প্রথম পুত্রকে দত্তক দিতে হবে জাহ্নবাকে। জাহ্নবার চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের আর্তিই যেন এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। রামচন্দ্র বা রামাইকে তিনি শুধু নিজ সন্তানের মতো প্রতিপালনই করেননি, মন্ত্রদীক্ষাও দিয়েছিলেন। নানান স্থান পরিভ্রমণের সময় বীরচন্দ্রের সঙ্গে রামচন্দ্রকেও নিয়ে যেতেন তিনি। সেজন্য নিত্যানন্দ প্রভুর শাখানির্ণয়ে বীরচন্দ্র ও গঙ্গামণির পাশাপাশি রামচন্দ্রের উত্তর প্রজন্মকেও নিত্যানন্দবংশ হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়।

চার

কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন তাঁর 'গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা' গ্রন্থে জানিয়েছেন, নিত্যানন্দ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম। ভাগবতে বলরামের দুই স্ত্রী—রেবতী ও বারুণী। তেমনই মহাপ্রভুর নদীয়ালীলায় নিত্যানন্দের দুই স্ত্রী—বসুধা (রেবতী) ও জাহ্নবা (বারুণী)। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে জাহ্নবা ও বসুধা আসলে ব্রজলীলার অনঙ্গমঞ্জরীর অবতার—যিনি ছিলেন শ্রীরাধার কনিষ্ঠা ভগিনী ও বলরামের লীলাসঙ্গিনী। বৈষ্ণব সাহিত্য ও তত্ত্বে জাহ্নবাকে মূলত অনঙ্গমঞ্জরীর অবতার হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। জাহ্নবা দেবীকে নিয়ে মধ্যযুগে বাংলায় যতগুলি জীবনী ও স্তুতিকাব্য লেখা হয়েছে, আর কোনও বাঙালি নারীকে নিয়ে গোটা মধ্যযুগে ততগুলি গ্রন্থ রচিত হয়নি। জাহ্নবা দেবীর জীবনগাথাকেন্দ্রিক কাব্যগুলি হল—রামচন্দ্র গোস্বামী রচিত 'অনঙ্গমঞ্জরী সম্পুটিকা', গতিগোবিন্দ রচিত 'জাহ্নবাতত্ত্ব মর্মার্থ', সুভদ্রা দেবী রচিত 'অনঙ্গকদম্বাবলী' এবং জীব গোস্বামী রচিত 'জাহ্নবাষ্টকম্'।

এর মধ্যে শেষের দুটি সংস্কৃতে লেখা। সুভদ্রা দেবীর কাব্যটি মধ্যযুগের বাংলায় এমন একটি বিরল কাব্য যেখানে একজন নারী আর-একজন নারীর মাহাত্ম্যের কথা বিবৃত করেছেন। জাহ্নবা-বন্দনা উঠে এসেছে বৈষ্ণব পদাবলি ও কীর্তনে। বিশেষত নিত্যানন্দ ও জাহ্নবার শিষ্য-কবিদের রচিত নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে ঈশ্বরী জাহ্নবার স্তুতি। জাহ্নবার দত্তকপুত্র রামচন্দ্র দাস গোস্বামী মাতা জাহ্নবাকে বন্দনা করেছেন বিনম্র শ্রদ্ধায়—

''ইষ্টদেব নিত্যানন্দ কেবল আনন্দকন্দ
সেই তনু অনঙ্গমঞ্জরী।
রাধার অনুজ এই বলরাম শক্তি সেই
গুরুরূপে হন অধিকারী॥...
সর্বভক্তিদাতা শিরোমণি।
তাঁহার অনুগ হইলে রাধাকৃষ্ণ প্রেম মিলে
অনায়াসে সর্বতত্ত্ব জানি॥''

মধ্যযুগে অন্দরমহলের চিরায়ত গণ্ডিকে স্বীকার করেও তাকে অতিক্রম করে জাহ্নবা দেবী সমাজে চিরস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে একডোরে বাঁধার কাজে তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় মুদ্রিত হয়ে থাকবে। ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। নরহরি চক্রবর্তী, *ভক্তিরত্নাকর* (প্রকাশক : রামদেব মিশ্র, মুর্শিদাবাদ, ১২৬০)

২। নরহরি দাস, *নরোত্তমবিলাস* (প্রকাশক: অধরচন্দ্র চক্রবর্তী, কলিকাতা, ১৩৩১)

৩। নিত্যানন্দ দাস, *প্রেমবিলাস* (প্রকাশক : যশোদালাল তালুকদার, বাগবাজার, ১৩২০)

৪। বৃন্দাবন দাস, *নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার* (নবীনচন্দ্র আঢ্য কর্তৃক মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৮৭৪)

৫। রাজবল্লভ গোস্বামী, *মুরলীবিলাস* (নন্দলাল পাল কর্তৃক মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৩৬৮)